International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
ISJN: A4372-3144 (Online) ISJN: A4372-3145 (Print)
Volume-III, Issue-VI, July 2017, Page No. 1-8
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

শম্ভু মিত্রের ‘একটা দৃশ্য’: সিনিসিজমের শীৎকারে সিক্ত বর্বর মূল্যবোধের উল্লাস

ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নহাটা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, নহাটা, উত্তর চব্বিশ পরগণা, ভারত

Abstract

Shambhu Mitra is the eminent actor and famous dramatist of modern Bengali drama. In the parallel comparison and criticism in between Shambhu Mitra, Utpal Dutta and Ajitesh Bandyopadhyay, it has been always discussed and concluded many times, that the dramatic compositions of Shambhu Mitra was mainly built by the conceptual idealism and artistic construction of Rabindranath Tagore. His dramatic composition like 'Ulukhagra', 'Ghurni', 'Bivab' and 'Ekta Drishya', Shambhu Mitra reflected some important problems related to Famine and Second World War like Black Marketing, Unemployment, Exploitation on Women, Dissolution of Humanity etc. His 'Ekta Drishya' is such a dramatic creation that showed these cruel reality of contemporary time vividly. The discourse of bodily gestures have also made this drama distinct from other. Also, the aspects of author's consciousness and attitude towards life, self image, socio-realism, irony etc. are also being projected vastly in this composition.

Key Words: Shambhu Mitra, Dramatic Compositions, Ekta Drishya, Problems related to Famine and Second World War, Discourse, Socio-Realism.

শম্ভু মিত্র প্রযোজিত ‘রক্তকরবী’ কিংবা ‘চার অধ্যায়’ নাটকের নাট্য রূপায়ণে রবীন্দ্রাদর্শে যে পথ পরিক্রমার শুরু, তারই পাশাপাশি সমসাময়িক কালে লেখা তাঁর অন্যান্য বেশ কিছু নাটক বাস্তব জীবনবোধে সমুজ্জ্বল। এ প্রসঙ্গে তাঁর ‘উলুখাগড়া’, ‘ঘূর্ণি’, ‘বিভাব’ এবং ‘একটা দৃশ্য’ নাটকের কথা বলা যেতে পারে। দু’দিক থেকে এ নাটকগুলির গুরুত্ব বিবেচ্য। প্রথমতঃ চল্লিশের দশকের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যথা মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, কালোবাজার, বেকারী, মধ্যবিত্তের মূল্যবোধে ভাঙন প্রভৃতি বিষয়গুলিকে নাটকের আধারে তুলে ধরা এবং দ্বিতীয়তঃ জীবনচর্যা ও নাট্যচর্যার যে খুব বেশী অন্তর নেই এই বোধকে পাঠকের হৃদয়ে জাগিয়ে তোলা। ‘উলুখাগড়া’ এবং ‘ঘূর্ণি’—শম্ভু মিত্রের লেখা প্রায় অবহেলিত এ দুটি নাটক শম্ভু মিত্রের মৃত্যুর আগের বৎসরে প্রকাশিত হয় ‘প্রারম্ভিক’ নামক গ্রন্থে গ্রন্থবদ্ধ হয়ে। আবার ‘উলুখাগড়া’ ও ‘একটা দৃশ্য’ নাটক দুটিও প্রায় একই সময়ে লেখা (১৯৪২-‘৪৩)। নাটক দুটির বিষয়বস্তু ও ব্যঞ্জনাগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেও অনেক সৌসাম্য রয়েছে। আঙ্গিকী প্রকরণের দিক থেকে ‘বিভাব’ অনেকটা-ই আলাদা হলেও চল্লিশের দশকের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ‘খাদ্য আন্দোলন’-এর কথা সেখানেও আছে। ‘ঘূর্ণি’ নাটকটি স্বাধীন ভারতবর্ষের বুকে রচিত হলেও (১৯৫০) বঙ্গে রাজনৈতিক পাশার চাল তখনও অব্যাহত। অভাবে, অনটনে তখনও পর্যুদস্ত বাংলার সাধারণ মানুষ। তাই ভাঙা দেশ আর ছিন্নমূল মানুষের মূল্যবোধের প্রশ্নে তাঁর অঙ্গীকার

চল্লিশের দশকে লেখা অন্যান্য নাটকগুলির মতোই অস্থিরতার দীপশিখায় কম্পমান। সমমনোভাবাপন্নতার দিক দিয়ে শম্ভু মিত্রের এ চারটি নাটক, সমসাময়িক সময়ে লেখা শিল্পকেন্দ্রিক পাঁচটি গল্প এবং বেশ কিছু প্রবন্ধকে তাই একই সারিতে রাখা যেতে পারে। বিশেষতঃ চল্লিশের দশকে সভ্যতার এ সংকটকালে উৎকট সমস্যার বিপরীতে একক মানুষের বাঁচার ও আদর্শ রক্ষার পথ আর টানাপোড়েনের যে লড়াইকে 'ঘূর্ণি' নাটকে দেখতে পাই, 'একটা দৃশ্য' নাটকটিকেও ভাবনার সেই একই বেদীতে রাখা যেতে পারে। একথা ঠিক যে, যে রাজনীতির অঙ্গুলী হেলনে সমাজ, দেশ আর মানুষের জীবনে অকাল খড়্গের আঘাত নেমে আসে, কী নাটক—কী জীবনে—কী বাস্তবে তার চিহ্ন চিরকাল অনুচ্চারিত ও অধরাই থেকে যায়। তবু তারই মধ্যে ফায়দার রাজনীতির এ বিপুল আয়োজনের স্পষ্ট ছবি যেমন ধরা পড়ে 'ঘূর্ণি' নাটকে, তেমনই তা ফল্গু ধারার মতো অন্তঃমনগহনে প্রবাহিত হয়ে যায় 'একটা দৃশ্য' নাটকেও। রাজনৈতিক পালাবদলের স্রোতপথে ভাঙনের নিনাদ শুধুই অসহায়ের আর্তনাদকে প্রকটিত করে তোলে। কখনও নাট্যকারের নিজের অবহেলা আবার কখনও বা প্রচারধর্মীতার অভাব এ নাটকগুলিকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসতে পারেনি ('ঘূর্ণি' নাটকটি শেষাবধি অভিনীত হয় নি)। লেখকের প্রচার-কুণ্ঠ মনোভাব তাঁর স্বভাব-বিনম্রতার লক্ষণ হলেও নাটকগুলির প্রতিটি চরিত্রের অভিনয়যোগ্যতাই যে যে কোনো অভিনেতার পক্ষেই তাঁর অভিনয় ক্ষমতা প্রদর্শনের পরম মাধ্যম হয়ে ওঠে একথা প্রকাশের অপেক্ষা রাখে না। কৃতিত্বের এ সদ্-ব্যবহারের পাশাপাশি নাটকগুলির বিষয় সাপেক্ষতা যুগ ও কাল সচেতন দর্শকদের কাছে সমসাময়িক পরিবেশের এক পরিপূর্ণ ধারণা নিয়ে উঠে আসে। গোটা চল্লিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশকের গোড়া পর্যন্ত দারিদ্র্য পীড়িত বাংলা, রাজনৈতিক দ্বিচারিতা, সমাজ বিচ্ছিন্নতা, ভ্রান্ত আদর্শ ও সুবিধাবাদী রাজনীতির স্বরূপ এ সময়কালে লেখা নাটক ও গল্পগুলিতে ধরা পড়েছে। নবনাট্য আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাস ও আদর্শের ভাঙনের কথাও এর সাথে কোথাও কোথাও জড়িয়ে আছে। অভাবে-অনটনে পর্যুদস্ত ও হতশ্রী বাংলার অবক্ষয়গ্রস্ত এই সমাজের বুক থেকেই আমাদের 'একটা দৃশ্য' নাটকের পেছনে থাকা নাট্যভাবনাটির উৎসটির অনুসন্ধান করতে হবে।

'একটা দৃশ্য' নাটকের পটভূমিকা রচিত হয়েছে মূলতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, '৪৩-এর মন্বন্তর, তৎসন্নিহিত রাজনীতি, কন্ট্রোল, রেশনিং ও কালোবাজারীকে পটভূমি করে। কিন্তু নাটকে কারণের থেকে এর ফলটাকেই তুলে ধরা হয়েছে বেশি। একটি পরিবার ও তার সদস্যদের মনে সমকালীন সময়ের অভিঘাত কিভাবে পড়লো এবং তা চরিত্রদের হৃদয়ে কি কি পরিবর্তন আনলো অথবা তা আলোড়নে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো সেটিই হলো এ নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়। সমকালের নির্মম বাস্তবকে চিহ্নিত করতেই নাটকে চরিত্রগুলির যুগোপযোগী অবস্থান। নাটকে বর্ণিত বিষয়বস্তু যে বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরেরই বিষময় ফল এ সত্য বুঝে নিতে যেমন পাঠককে একেবারেই বেগ পেতে হয় না তেমনই সমাজ যে শেষপর্যন্ত স্বার্থসিদ্ধকারী রাজনীতির ঘুঁটির চালেই মাত হয় নাটকের অন্তিম পরিণতিটিও সেই সাক্ষ্যই দেয়। একসময় নাটকটি 'বহুরূপী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নাটক সম্পর্কে সম্পাদকের মুখ্য বক্তব্যটিও সে সময় পত্রিকায় প্রকাশিত নাটকটির শেষে মুদ্রিত হয়েছিল। সম্পাদকের মন্তব্যটি ছিল এরূপঃ

"হঠাৎ বন্ধু প্রদুম্ন ভট্টাচার্য খবর দেন যে শ্রী শম্ভু মিত্রের একটি পুরোনো নাটিকা শ্রী সুধী প্রধানের কাছে রাখা আছে। আমরা এটি পেতে এবং প্রকাশ করতে আগ্রহ প্রকাশ করি। শ্রী ভট্টাচার্যের উদ্যোগে শ্রী শ্যামলী সুর নাটিকাটি কপি করে আনেন। মূল পান্ডুলিপি শ্রী প্রধানের কাছে আছে। ১৯৪৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর মিনার্ভায় গঙ্গাপদ বসুর নির্দেশনায় 'একটা দৃশ্য' অভিনীত হয়। সেদিন এর সঙ্গে অন্য অনুষ্ঠান ছিল ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের ব্যালে 'দিস আওয়ার ল্যান্ড'। নির্দেশনার সময় গঙ্গাপদ বসু এতে কিছু মঞ্চনির্দেশ ইত্যাদি যোগ করেন। আমরা শ্রী বসুর সংযোজন বাদ দিয়ে শ্রী শম্ভু মিত্রের লেখা অবিকল ভাবে ছেপেছি। শ্রী সুধী প্রধান জানিয়েছেন, এই নাটিকায় অভিনয় করেছিলেন কল্যাণী, সাধনা প্রভৃতি শিল্পীরা। অর্থাৎ কল্যাণী কুমারমঙ্গলম, সাধনা রায় চৌধুরী প্রমুখ। পান্ডুলিপির সযত্ন সংরক্ষণ এবং আমাদের সঙ্গে সহৃদয় সহযোগিতার জন্য শ্রী প্রধানের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য ও শ্যামলী সুরকেও আমাদের ধন্যবাদ জানাই। শ্রী মিত্রকে নাটিকার কপি দেখাতে তিনি হেসে বললেন, 'কত পাপই যে করেছি! সবই আপনারা ছাপবেন না কি? এসব তো ছাপে লোক মরে গেলে পর। কিন্তু আমি তো এখনো---

-বলতে নেই----' যাই হোক্, নানা বিতর্কের পর শ্রী মিত্র নাটিকাটি ছাপতে নিমরাজি হলেন।" এই হলো নাটক ছাপা তথা প্রযোজনার একেবারে গোড়ার কথা। সম্পাদকের মন্তব্যটিতে অভিনয় প্রসঙ্গে আরো যা জানা যা তা হলো, এ নাটকে নগেনের বাবার ভূমিকায় অভিনয় করেন শ্রী চারুপ্রকাশ ঘোষ, এবং বড়ো ছেলের চরিত্রটিতে অভিনয় করেন শ্রী গঙ্গাপদ বসু।

'একটা দৃশ্য' নাটকের অংক ও দৃশ্য একটাই, চরিত্র পাঁচটি। চরিত্ররা হলো 'বাবা' (নগেন, সাধন ও গাতির বাবা, নাটকে যার আলাদাভাবে কোনো নাম নেই), বড় ছেলে নগেন, বড় ছেলের বৌ সাবিত্রী (নাটকে 'বউটা' নামে চিহ্নিত), ছোট ছেলে সাধন (নাটকে প্রথমদিকে 'আগন্তুক' নামে চিহ্নিত) এবং নগেন ও সাধনের একমাত্র বোন গাতি (নাটকের প্রথমে যে 'মেয়েটা' নামে চিহ্নিত)। আকস্মিক ও তীব্র গতির এক নাট্যমূহূর্ত দিয়ে এ নাটকের শুরু। নাটকের গোড়াতেই দেখি পরিবারের বড় ছেলে নগেন উত্তেজিত ভাবে তর্জন-গর্জন ও জেরা করছে তার বোন গাতিকে। ঘটনা পরম্পরায় জানা যায়, গাতিকে নগেন উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে মিলিটারীদের গাড়ীতে আরোহনরত দু'জন মিলিটারীর কাছ থেকে। নগেনের সন্দেহ, অভাবের বশবর্তী হয়ে তার বোন স্বেচ্ছায় ও অর্থের বিনিময়ে মিলিটারীদের দেহদান করেছে। এই পাপ সম্ভাবনার সন্দেহে ক্রমশঃ শিহরিত হয়ে উঠেছে তার মন। যত তার মনে এই বিষাক্ত সন্দেহের তীর তীব্র হয়ে উঠেছে ততই গাতির প্রতি তার তর্জন-গর্জন বৃদ্ধি পেয়েছে আর এর প্রকৃত কারণ জানতে গাতিকে মূর্হুমূর্হু প্রশ্নবানে বিদ্ধ করে তুলেছে সে। নগেনের সঙ্গে অসহায়া গাতিকে আক্রমনের শিকার করেছে নগেনের স্ত্রী সাবিত্রীও। তবে ঘটনার পেছনের প্রকৃত কারণ আবিষ্কার তার লক্ষ্য নয় বরং নিশ্চিত ভাবেই গাতিকে নষ্ট মেয়ে ধরে নিয়ে তার নোংরা সমালোচনা করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। কত টাকার বিনিময়ে গাতি ঐ মিলিটারীদের দেহসঙ্গ দিয়েছে গাতির কাছে এ প্রশ্নের উত্তর জানতে যখন নগেন চূড়ান্ত নিষ্ঠুর ও পাষান-কঠিন হয়ে উঠেছে ও সেইসঙ্গে গাতিকে অসতী প্রমাণে সাবিত্রী যখন প্রায় এক নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে, ঠিক তখনই কান্নায় বিস্ফোরিত গাতি অসম্মানের শেষ সীমায় পৌঁছে জানিয়েছে যে, বাবাই তাকে গতকাল টাকার বিনিময়ে একজন লোকের কাছে বিক্রি করে দেয়, আর তারপর সেই লোকটির মাধ্যমে সে বিক্রি হয়ে যায় ঐ মিলিটারীদের কাছে। বিস্মিত, হতবাক্ নগেন এরপর চিৎকার করে সবাইকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। যদিও বোন গাতিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা তার মনেও হয় না। সবাই বেরিয়ে যায়। এরপর নগেন একা ঘরে নিঝঝুম হয়ে বসে থাকে।

নাটকে দেখি, এরপরই সে ঘরে প্রবেশ করেছে নগেনের ছোটভাই সাধন। ব্যায়াম করা পুষ্ট চেহারা তার। হাতে দুটো বড় বড় বস্তা। তাতে আছে কন্ট্রোলের দিনে বোঝাই করা চোরাই কাপড়। দরজা বন্ধ করে বস্তা দুটোকে সন্তর্পনে ঘরে রাখা তক্তোপোষের নীচে ঢুকিয়ে দেয় সে। এরপর সাধন দাদাকে জানায় দক্ষিণেশ্বরী মিলের এজেন্ট শ্রীশবাবু খানাতল্লাশীর ভয়ে মার্কা ছাড়া কাপড়ের পেটি বড়বাজারের মাড়োয়ারীকে দিতে না পেরে সাধনকে তা লুকিয়ে রাখতে বলেছে। বিনিময়ে সাধন পাবে তিরিশ জোড়া ফাইন শাড়ি। সাধনের সোজা হিসাব হলো—কন্ট্রোলের বাজারে এগুলো বিক্রি করতে পারলে শাড়ি পিছু দু'টাকা করে থাকলেও তিরিশ জোড়া শাড়িতে তার পকেটে আসবে কড়কড়ে একশো কুড়ি টাকা। কালোবাজারীর দিনে সাধন যে নীতির ধার ধারেনা তা তার কথাতেই বোঝা যায়। বোন গাতির ঘটনা শুনে সে তার মাতাল বাপকে গালি দেয়। কিন্তু এ ছাড়া বোনের ভবিষ্যৎকে কেন্দ্র করে তার মনে আর তেমন কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় না। বাপের বিরুদ্ধে তার নানা অভিযোগ। তার বাপই না কি শ্রীশবাবুকে গিয়ে বলেছে যে সাধন শ্রীশবাবুর টাকা চুরি করে দোকান দিয়েছে। সাধন কন্ট্রোলের চিনি ব্ল্যাকমার্কেটে বিক্রি করে কিংবা রেশনের চালে কাঁকর মিশিয়ে চাল বের করে নেয়—এসব বক্তব্যও তার। কিন্তু নগেন জানে যে সাধনও ধোওয়া তুলশী পাতা নয়। এই সাধনই একদিন মা-র গহনাগুলো জোর করে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল বাবার কাছ থেকে। নগেনের চোখে আজ অবস্হার ফেরে বাবা যেমন অপরাধী তেমনই আর এক অপরাধী সাধনও। কিন্তু নগেন সাধনকে এমন অভিযোগ জানাতে গেলে নগেন ও সাধনের মধ্যে প্রচণ্ড বাক্-বিতণ্ডা শুরু হয়। নগেনের আরো অভিযোগ, বছর চারেক আগেও আখড়ার দল নিয়ে সাধন গুন্ডামি করেছে, ইস্কুল-কলেজের

মেয়েদের টিটকারি দিয়েছে। তারপর সে মায়ের গয়নাগুলো কেড়ে নিয়ে দোকান করেছে, শ্রীশবাবুর কন্ট্রোলের চিনি লুকিয়ে রেখেছে আর পথে পথে যখন লোকে না খেতে পেয়ে মরছে তখন শ্রীশবাবুর চোরা চালের কারবারে দালালি করে অবৈধ পথে নিজের রোজগার বাড়িয়েছে। নগেন যাই বলুক না কেন, সাধন বোঝে তার আসল লক্ষ্মী হলো—ব্যবসা। তার চোখে কন্ট্রোল আর রেশনিং-এর জন্য প্রকৃত দায়ী হলো ইংরেজ, আর শ্রীশবাবু হলেন এক মস্ত স্বদেশী। কিন্তু নগেন জানে, শ্রীশবাবুর মতো ধনী মহাজনরাই হলো আসলে সত্যিকারের চোরাকারবারী। শ্রীশবাবুদের মতো জোচ্চোরদের আর যাই বলা যাক দেশভক্ত বলা যায় না। নগেনের তিরস্কারকে সাধন ছোট চোখে দেখে। তার মনে হয় সাধন দু'পয়সা রোজগার করছে—এটা নগেনের সহ্য হচ্ছে না, তাই সে তাকে ঈর্ষা করছে। পরিবারের সমস্ত খরচ চালায় নগেন অথচ সাধন সর্বদা দাবী করে বেড়ায় যে, বাড়ীতে তার অর্ধেক অধিকার। সাধনের অভিযোগ, ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় যে সে বঞ্চিত তার কারণও তার বাবার অবহেলা। তাই দাদা নগেন ম্যাট্রিক পাশ করলেও তার পড়াশোনা ক্লাস ফাইভের বেশি এগোয়নি। সাধন আরো মনে করে, সংসারের পিছনে নগেনের টাকা খরচের একমাত্র কারণ তার আপন মহত্ত্ব আর টাকার বড়াই দেখানোর চেষ্টা। দুনিয়ার আর সকলের মতো নগেনের মনিবও জোচ্চোর। আর সেই মনিবের টাকা বাড়াতেই কাজ করে যায় নগেন। তাই তার ধারণা, সততার কোনো রোয়াবিই যেমন নগেনের সাজে না, তেমনই নগেনের এই মিথ্যে দর্পই একদিন তার চরম সর্বনাশ করবে।

নাটকে দেখি চারদিক থেকে ক্রমাগত আক্রমনে নগেন প্রায় জেরবার হয়েছে। এমনকি তার নিজের স্ত্রীও তাকে সকল পাপ কাজের জন্য সোচ্চারে দায়ী করেছে। সাধনকে পুরোপুরি সমর্থন করেছে সাবিত্রী। এরপরই দেখি, নগেন প্রাণপণ চেষ্টা করে সংসারের কর্তা হিসাবে নিজের অবস্থানকে জোর করে প্রতিষ্ঠা করার, কিন্তু তার স্ত্রী সাবিত্রী অথবা ভাই সাধন কেউ তাকে মানতে চায় না। নগেন সাধনকে পুলিশে দেবার কথা বললে সাবিত্রী তাকে তীব্র ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় অপমান করে। নগেন যে তাকে নোংরা সন্দেহ করে এমন অভিযোগেও তাকে বিদ্ধ করতে চায় সাবিত্রী। কিন্তু নগেন সকল নোংরামি আর সকল নীচতা থেকে ভীষন জেদে জেগে উঠতে চায় এবং তাদের সকলকে সে সেখান থেকে চলে যেতে বলে। ঠিক এমনই মুহূর্তে মঞ্চে প্রবেশ করে উস্কোখুস্কো চেহারা, কাঁচা-পাকা দাড়ি গালে অত্যন্ত বাউন্ডুলে চেহারার একটা লোক। সে নগেন ও সাধনের বাবা। এমন মানসিক অস্থিরতার মধ্যে নগেনের বাবা নগেনের কাছে দু'টাকা ধার চাইলে বিপর্যস্ত নগেন অকস্মাৎ বাপের মুখে উপর্যুপরি কয়েকটা চড় কষিয়ে দেয়। বাপ মাটিতে পড়ে যায়। নগেনের রাগের মূল কারণ—পয়সার বিনিময়ে নিজের মেয়ে গাতিকে বিক্রি করেছে বাবা। কিন্তু এই বাবাই একদিন ছিল নগেনের কাছে গর্ব। এই বাবাই একদিন তার মনে 'প্লেন লিভিং এন্ড হাই থিংকিং'-এর আদর্শ সঞ্চার করে তুলেছিল। অথচ আজ সেই বাবা ধেনো মদ খায় আর আরো মদ খেতে নিজের মেয়েকে বিক্রি করে দিয়ে ছেলের কাছ টাকা চায়। বাবার এই অধঃপতন নগেনকে কাতর করে।

নাটকে দেখি, নগেনের বাবার কথায় উঠে এসেছে তার অবমানিত মূল্যবোধের ফলে এক অসহ্য পরিবর্তনর ছবি। নগেনের বাবা একদা সৎ স্কুল শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু আজ তিনি আদর্শভ্রষ্ট। যে বাবাকে নিয়ে একদিন গর্ব করতো নগেন, সে আজ মাতাল, চরিত্রহীন। আবেগে বিধ্বস্তপ্রায় নগেন বাবাকে আবার স্কুলের চাকরী নিতে বলে। কিন্তু বাবার কথায় তার কাছে আজ আগের জীবনটা এক প্রহসন! নগেন দেখে তথাকথিত সেই মূল্যবোধ যেন কোন এক অদৃশ্য জাদুবলে পালটে গিয়ে আজ শুধু চারিদিকে পচনের দুর্গন্ধই ছড়ায়। যুদ্ধ আর জাপানি বোমার আক্রমণে যখন শহরের স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে গেল, লোকে দিশেহারা হয়ে তখন ছুটে গেল গ্রামে। কিন্তু ততদিনে শহর থেকে গ্রাম—সর্বত্র কালোবাজারীর শিকড় বিস্তৃত হয়ে গেছে। হায়েনার হাসির মতো ক্লেদাক্ত অর্থ-লোলুপতা, জৈবিক শীৎকারে জর্জর নারীমাংসলোভী শিকারান্ধ মানুষ মূল্যবোধের শেষ বাকলটি খসিয়ে শুধুমাত্রই আখের গোছানোর বর্বর উল্লাসে মেতে উঠেছে। আর সেই স্রোতে মিশে কোথায় হারিয়ে গেছে নেশার দাস নগেনের বাবার সমস্ত আত্মসম্মান আর হিতাহিত জ্ঞান। কিন্তু তবুও বাপের এই আত্মিক পতনকে কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে চায় না নগেন। সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি, এ নিদারুন পরিস্থিতির প্রতি—কি এক জান্তব ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে দু'হাতে সে

টিপে ধরতে চেয়েছে তার বাবার গলা। অথচ গাতিকে বেচে দেবার জন্য বাবার মনে নেই কোনো অনুশোচনা অথবা অনুতাপের জ্বালা। বাবার কথায়—সব ভালো কথার পালিশ শুধু ওপরে, ভেতরে আঁচড় কাটলে দেখা যাবে স্বার্থপরতার সেই বিষাক্ত নাগ আর লোভের আদিম জানোয়ারটা গা জড়াজড়ি করে বসে আছে। শিক্ষার নামে ব্যবসা হয়, স্ত্রী অসতী হয়, ছেলে বাপকে প্রহার করে শুধুই অর্থের টানে। ভালো তাই আজ আর কোথাও নেই! বাবার কথায়—নিজে ভালো করে বাঁচবার ফিকির খুঁজতে আত্মহারা মানুষ যদি নেশার বশে, টাকার মোহে নিজের মেয়েকেও অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়—তবে তাও আজ আর অন্যায় নয়। মাতলামির ঝোঁকে বলা বাবার কথায় আর হো—হো—হাসিতে যে আত্মবিস্মৃত অস্থিরতা, বিহ্বল অবিশ্বাস ঝরে পড়ে তাতে নগেনের বিশ্বাসের দুনিয়াটা কেমন যেন কেঁপে যায়। তার নিজের মনের বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে—কখনও মনে হয়, ভালো থাকবার ও ভালো করবার সত্যিই কি কোনো দাম নেই? অধিকার নেই? মিথ্যার জয়ই কি সর্বশেষ আর সার্বভৌম সত্য? এতদিন ধরে সংক্ষুব্ধ মনে যে টালমাটাল সত্য বিশ্বাসটাকে প্রাণপন পরিশ্রমে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে গেছে সে, সিনিসিজমের এই দামাল হাওয়া আর বর্বর উল্লাসের মাঝে পড়ে শেষপর্যন্ত তাকেই হারিয়ে যেতে দেখে আতংকে কুঁকড়ে গিয়েছে তার মন। নেতির এই সর্বগ্রাসী ধ্বংসযজ্ঞে বাবার সকল জ্ঞান ও মূল্যবোধের সর্বসত্তাকে হারিয়ে যেতে দেখেছে সে, দেখেছে তাকে এক স্বার্থবুভুক্ষু অমানবিক কায়ামাত্র হয়ে উঠতে—তার ভয়, সেই মিথ্যার মরীচিকায়—মন্দের কালিমায় সেও একদিন তার সত্যের শেষ সঞ্চয়টিকে খুইয়ে ফেলবে না তো? নাটকের এ পর্বটি যেন নগেনের মনের এক আত্মিক সংকটকেই ঘনীভূত করে তুলেছে। তবু চারিদিকের এ চরম পতনের মাঝখানে দাঁড়িয়েও নগেন লড়াই করতে চেয়েছে। এ লড়াই একান্তই তার একার লড়াই। তা শুধু নিজের বাঁচার লড়াই নয় বরং অন্যকে বাঁচানোরও লড়া। তা মিথ্যার গ্রাস থেকে সত্যকে রক্ষা করাবার লড়াই। নাটকের একদম শেষে দেখতে পাই, সমস্ত নোংরামি, ইতরামি আর জোচ্চুরির জঞ্জাল ছিন্ন করে নগেন আবার নতুন আশা ও বিশ্বাসে বেঁচে উঠতে চেয়েছে। সে বলে, বাঁচতে না পারুক অন্ততঃ একবার বাঁচার চেষ্টা করে তবেই সে মরতে চায়। উদভ্রান্ত আক্রোশে ঘরের আসবাবপত্র উলটে-পালটে অবচেতন মনে বন্দী থাকা অসহায়ত্বের জগৎ ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে সে।

'একটা দৃশ্য' নাটকটিতে মূলতঃ যুদ্ধ ও মন্বন্তরের ফলে সৃষ্ট সামাজিক ও পারিবারিক কুফলকে নাটকের আধারে তুলে ধরার চেষ্টা রয়েছে। এ নাটকে গাতির নারীত্বের অবমাননা যেমন এক সামাজিক পচনকে তুলে ধরে তেমনই নগেনের বাবার অপসৃত মূল্যবোধ তার মানসিক বৈকল্যকেই প্রকটিত করে। নাটকের একদম শেষে নগেনকে বলা বাবার উক্তির মধ্যে দিয়ে দেশ-কালের এই সামগ্রিক অবক্ষয় সূচিত হয়েছে। যথাঃ

বাবা : (জোর দিয়ে বলে) বেশ করিছি, বেশ করিছি। ভালো বলে কিছু আছে পৃথিবীতে? নীতি বলে, ন্যায় বলে, সৎ বলে, শান্তি বলে কিছু আছে জগতে? যা কিছু ভালো সব ঐ ওপরে পালিশ! আঁচড় কাট, দেখবি সেই আদিম জানোয়ার আর তার স্বার্থ জড়াজড়ি করে বসে আছে। (তিক্তভাবে হেসে) ভালো ভালো কথা অনেকদিন বলেছি, অনেকদিন চেষ্টা করেছি ওই সমস্ত কথার ওপরে বিশ্বাস রাখবার। কিন্তু ঐসব ভাঁওতাবাজি আর চলবে না। কীসের তুই সংসার সংসার করছিস্, কীসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত সংসার? মাস্টারির সম্মান নিয়ে বিরাট লেকচার মেরে দেশের লোক ২৫ টাকা মাইনে গুঁজে দেয় পকেটে। বোর্ড—এর খোসামুদি না করলে আবার সেই ২৫ টাকার চাকরীও বাঁচে না! বুড়ো পণ্ডিতমশায়ের মতো হয়ে পড়লে চাঁদা তুলে রাহা খরচ জুগিয়ে ভাগিয়ে দেওয়া হয়। ব্যবসা শুরু হয়েছে শিক্ষার নাম ক'রে। এ তোর ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত। তারপর তোর ঘরের সংসারটাই বা কী? বাড়ির কর্তাকে কর্তা বলে মানে, কেননা সে টাকা রোজগার করে; ছেলে বাপকে মানে যদ্দিন বাপের হাতে টাকা থাকে, নইলে ধরে ঠ্যাঙায়।; স্ত্রী সতী থাকে যদ্দিন জানে যে অসতী হওয়ার চেয়ে সতীত্বের সিকিউরিটি বেশি। তাই আমি উড়িয়ে দিয়েছি, উড়িয়ে দিয়েছি আমার মন থেকে ঐ সমস্ত কথার জাল-বোনা ঢাকা। আজ আমার জগতের সঙ্গে যে পরিচয় সেটা উলঙ্গ পরিচয়, নগ্ন পরিচয়। বেশ করিছি গাতিকে বেচিছি। বেশি রোজগার করবে, ভালো করে বাঁচবে, ভালো খাবে থাকবে বলে-- (হঠাৎ কী মনে করে মুখটা একদম বদলে যায়। চতুর শয়তানের মতো হি হি করে হেসে) আর আমিও ধেনো খেয়ে নর্দমায় গড়াবার একটা সুযোগ পাব বলে!"

নগেনের বাবার এই দীর্ঘ সংলাপের সারাৎসার আমাদের বিচলিত করে। দেশের আর্থিক ও মানবিক সংকটের এই স্পষ্ট স্বরূপ অবলোকন করে আমরা শিহরিত হই। এরই বিপরীতে নগেনের ভগ্নপ্রায় আদর্শকে টিঁকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টাকে দেখতে পাই বাবাকে বলা নগেনের শেষ সংলাপটির মধ্যে দিয়ে। যথাঃ

নগেন : না—-না—-না। আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবী থেকে সমস্ত কিছু ভালো এখনো ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। অন্ততঃ এই বিশ্বাস নিয়েই আমি চেষ্টা করব ভালো করে বাঁচবার। তোমার এই পচা বাড়িটার অন্ধকার কোণে কোণে জমে উঠেছে পাপ—জমে উঠেছে নোংরামি—ইতরামি--জোচ্চুরির জঞ্জাল। আমি সব কিছু ভেঙে চুরমার করে ফেলব—তার ওপর নতুন সংসার গড়ব। বাঁচতে না পারি, অন্তত বাঁচবার চেষ্টা ক'রে মরব—

নগেনের এ উক্তি থেকে আর যাই হোক্ এটা পরিস্কার যে, সমকালে দাঁড়িয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে নাট্যকার এমন বেশ কিছু মানুষকে দেখেছিলেন যাঁরা সেই নিঃসীম পতনের দিনেও সত্যাদর্শের নিষ্ঠাকে এমনভাবেই বুক দিয়ে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। নাটকটি পড়তে গিয়ে কখনও কখনও আমাদের গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকটির কথা মনে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু পরিবারের প্রধান নগেন 'মূল্যবোধের বিচ্যুতি'—নামক খাদের কিনারে দাঁড়িয়েও 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশের মতো 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' গোছের ঋণাত্মক ভাবনার ভরাডুবিতে ভেসে যেতে চায় নি, পিতার মতো 'পানদোষ' কিংবা ভ্রাতার (সাধন) মতো 'সঙ্গদোষ' তাকেও স্পর্শও করেনি। পরমহংসের মতো অবাধ সন্তরন সম্ভব না হলেও পক্ষচ্ছেদনের ভয়কে জয় করেই ক্ষতদুষ্ট সমাজের মলিন জলে শেষপর্যন্ত সে তার অমলিন ও অসংখ্য পক্ষবিস্তারের আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছে। তবু তার লক্ষ্য ও সাফল্য সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলি উঠে আসে সে প্রসঙ্গে আমরা পরে যাবো।

যুদ্ধ ও মন্বন্তর সমকালীন শোষক, শোষিত ও মধ্যস্বত্ত্বভোগী—এই তিনটি শ্রেণিকেই তিনটি প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এ নাটকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে প্রত্যক্ষ শোষক হিসাবে শ্রীশবাবু নাটকে উপস্থিত না থাকলেও সাধনের সংলাপের মধ্যে দিয়ে তার নেপথ্য কার্যকলাপের পিছনের দুষ্টতা ও ধূর্ততা সম্পর্কে অনুভব করা যায়। সাধন—এ নাটকে শোষকের হাতের ঘুঁটি এক মধ্যস্বত্ত্বভোগী মাত্র। অন্যায়কারীকে যে সমর্থন করে—তার অন্যায়ও অন্যায়কারী থেকে কিছু কম হয় না। সে অর্থে, সাধনকে সমর্থন করে সাবিত্রীও এ দুষ্টচক্রের পরোক্ষ অংশীদার হয়ে গেছে। সমকালীন রাজনৈতিক দলগুলির দ্বিচারিতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে শ্রীশবাবুর ভূমিকায়। সবমিলিয়ে এক দারিদ্র্যপীড়িত, অবক্ষয়গ্রস্হ, ক্রমক্ষয়িষ্ণু, ভাববিচ্ছিন্ন বঙ্গদেশের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে এ নাটক।

নাটকে গাতি চরিত্রটি শোষণের প্রত্যক্ষ শিকার হলেও বিকারগ্রস্ত নগেনের বাবা হলো এর পরোক্ষ ফল। শুধু নিজের বিশ্বাসে অটল থেকে পাপের এই কালচক্রে পাপীদের বিরুদ্ধে একা লড়াই করতে চেয়েছে নগেন। নাট্যকার দর্শক হৃদয়ে নগেনের আশাবাদের প্রতিবিম্বরেখাটিকে অংকন করেই নাটকটি শেষ করতে চেয়েছেন, কিন্তু তবুও নাটক শেষে এক কঠিন প্রশ্ন থেকেই যায়। যে সর্বগ্রাসী লোভ ও সর্বানাশা পাপের বিরুদ্ধে নগেনের লড়াই—তা শেষপর্যন্ত সফল হবে কি? সর্বব্যাপী দুরন্ত মিথ্যার বেসাতির বিপরীতে নগেনের সত্য আদর্শ ও বিশ্বাসের স্তম্ভ কতকাল অটুট রইবে? যেখানে রাজনীতি থেকে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রকদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র আর শোষকের স্বার্থসন্ধানী ইতর পংকিলতা গলাগলি করে দেশ ও জাতির সমগ্র অস্তিত্বকে ক্রমশঃ কংকালসার করে তুলেছে সেখানে নিজের পরিবারের জন্য— 'নতুন সংসার' গড়ার জন্য নগেনের এই একক প্রচেষ্টা— এ মরনপণ লড়াই শেষপর্যন্ত মহাকালের দরবারে কোনো সত্যমূল্যে ধরা দেবে কি? দুঃখজনক হলেও, নগেনের আশাবাদী মনের শেষ প্রাপ্তিকে নাটক শেষে শূণ্য বলেই মনে হয়।

এ নাটকে সবচেয়ে বেশি আবেগ সঞ্চারিত হয়েছে নগেন চরিত্রে। নগেনের বাবা ও গাতির সংলাপও কখনও কখনও আবেগময়। বাস্তব লোভের পিছনে ধাওয়া করে একমাত্র সাধনই ক্রমেই বাস্তববাদী(?) চরিত্র হয়ে উঠেছে। তাকে অনুসরণ করেছে সাবিত্রী। পার্থিব লোভ (সাধন মা'র গয়না ছিনিয়ে নেয়) ও অন্যায় বাসনা (সাবিত্রী দামী

শাড়ী চায়) এদের এতটাই বেশি বলে মনে হয়, যে আবেগ লুপ্তির পাশাপাশি প্রয়োজনে তীব্র ঘৃণা, অশ্রদ্ধা, ব্যঙ্গ ও তিরস্কারকেও যে এরা হাতিয়ার করতে পিছপা নয়—তাও বেশ বোঝা যায়। নাটকে গাতির পরিণাম ও নগেনের সংলাপে যুদ্ধ ও মন্বন্তরের সামাজিক তথা পারিবারিক অভিঘাত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়েছে সবচেয়ে বেশি। বিপন্নতার অভিঘাতও বেশি করে স্পষ্ট হয়েছে এ দুটি চরিত্রেই। লোভ আর স্বার্থপরতাই সাধন ও তার বাবাকে নগেনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তবুও অবমানিতা গাতিকে তার সংসার থেকে ত্যাগ করেনি নগেন। এ তার মহানুভবতারই লক্ষণ। সাবিত্রী যেভাবে স্বামীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছে ও সাধনকে সঙ্গ দিয়েছে তাতে তাকেও একেবারেই সতীলক্ষ্মী বলা যায় না। সেও স্বার্থপরের মতো সুযোগের সদব্যবহার করতে ছাড়েনি। এ নাটকের সংলাপে তদানিন্তন কলকাতার কথ্যবুলির ছাপ রয়েছে। 'দোবো', 'নোবো', 'বিদেয়', 'বুঝিচি', 'বেচিছি', 'করিছি' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ সাধারণতঃ কথ্যরীতিতেই হয়ে থাকে। নাটকের একেবারে শেষে 'মরে যেতে দেবো না—দেবো না' গানটি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান' থেকে ব্যবহার করেছেন লেখক। নাটকের শেষে এই গানের মধ্যে দিয়েও আশাবাদের সুর ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। আক্ষেপ—আক্রোশ—তথা মানসিক উত্তেজনা বশতঃ নগেন যেভাবে আসবাবপত্র উলটে পালটে ফেলেছে তাতে তার আশা আদৌ বাস্তবায়িত হবে কি না সে সম্পর্কে সংশয় থেকেই যায়। সংসার মানুষকে নিয়েই তৈরী হয়, আর নগেন যে 'নতুন সংসার'—এর সাধকে তার মনে পোষণ করে সে সংসারের প্রতিটি চরিত্রই কোনো না কোনো ভাবে ভ্রষ্ট—তা সে শারীরিক হোক্ বা মানসিক। সুতরাং নষ্ট দুনিয়ার শরিক এই মানুষগুলোকে নিয়ে তার 'নতুন সংসার' গড়ার সাধ শেষপর্যন্ত কতখানি সফল হবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়। আসবাবপত্র উলটে-পালটে ফেলার মধ্যে দিয়ে কীটদষ্ট সমাজকে ধ্বংস করার জন্য নগেনের অবচেতন মনের আবেগ ও প্রতিক্রিয়াই বাস্তব রূপলাভ করেছে।

নাটকটির নাম 'একটা দৃশ্য'। নামকরণ নিয়ে কিছু বলার পূর্বে আলোচ্য নাটকটি শেষে 'বহুরূপী' সম্পাদকের কিছু নিজস্ব বক্তব্যের অবতারণার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। যথাঃ **"শ্রী মিত্র জানালেন যে এটি আসলে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রথম দৃশ্য। তিনটি দৃশ্যে এটি শেষ হবে ভাবা ছিল। দ্বিতীয় দৃশ্যের কয়েক পাতা লেখাও হয়েছিল। সে পাতাগুলোর কোনো হদিশ করা যায়নি। এর রচনাকাল ১৯৪৪ বা ১৯৪৫, অর্থাৎ 'উলুখাগড়া' ও 'ঘূর্ণি'-র মধ্যবর্তী সময়ে। ১৯৪৫ সালে 'ধরতি কে লাল' করার জন্য কিছুকাল বোম্বাইতে ছিলেন শ্রী মিত্র। কোনো কাজে মধ্যে একবার কলকাতায় আসেন। যেদিন আসেন, সেই দিনই সন্ধেয় মিনার্ভায় পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানটি ছিল। শ্রী মিত্র সেখানে যান। তখনো তিনি জানতেন না যে তাঁর নাট্যাংশ 'একটা দৃশ্য' নামে অভিনীত হবে। দেখে বুঝতে পারেন। কে কবে তাঁর কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি নিয়েছিল তা তাঁর মনে নেই। তাঁর যতদূর মনে আছে, বাবার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন চারুপ্রকাশ ঘোষ, এবং বড়ো ছেলের চরিত্রটি করেছিলেন গঙ্গাপদ বসু।"** বহুরূপী সম্পাদকের এ বক্তব্য থেকে প্রথমতঃ এটা পরিস্কার যে, 'একটা দৃশ্য' নাটকটি আসলে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রথম দৃশ্য। যেহেতু নাটকটি তিনটি দৃশ্যে শেষ হবে এরকমটি ভাবা হয়েছিল এবং তা শেষপর্যন্ত হয়নি, এমন কি দ্বিতীয় দৃশ্যের কয়েকটি পাতা লেখা হলেও পরবর্তীতে সেগুলোর কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি—এই পরিপ্রেক্ষিতে শেষমেশ একটি দৃশ্যে সমাপ্ত নাটকটির 'একটা দৃশ্য' নামকরণ যে আক্ষরিক অর্থে যথার্থ এমনটা ধরে নেওয়াই যায়। কিন্তু আমার মতে এ নামকরণের আরো এক বা একাধিক ব্যঞ্জণার্থ আছে। প্রথমতঃ যুদ্ধ ও মন্বন্তর সময়কালীন আর্থিক ও মানবিক পতনের অজস্র ঘটনাসমূহের মধ্যে নাট্যকারের বলা নাট্য ঘটনাবস্তুটি একটা দৃশ্য মাত্র—যা সমকালের সমধর্মী অন্যান্য ঘটনাবস্তু থেকে বিচ্ছিন্নও নয়, আবার সম্পূর্ণও নয়—এমন অর্থে নাটকের নামটি 'একটা দৃশ্য' ভাবা যেতেই পারে। এই 'একটা দৃশ্য'-ই যেন সমকালীন ও সমধর্মী অন্যান্য আরো অনেক দৃশ্যের প্রতি আমাদের মনঃসংযোগ ঘটাতে সাহায্য করে। আবার 'দৃশ্য' কথাটির ওপর নাট্যকারের জোর পাঠকের অবচেতন মনে ছেয়ে যায়। প্রথমতঃ 'দৃশ্য' আর 'শ্রাব্য' কথাদুটির মধ্যে অর্থগত ফারাক যতটা, 'চোখে দেখা' আর 'কানে শোনা'—অনুভূতিলব্ধ সংবেদনের ফারাকও ঠিক ততটাই। বলাইবাহুল্য, চোখে দেখার অনুভূতি কানে শোনার চেয়ে আরো তীব্র। নাট্যকার যেন সেই তীব্র সংবেদনকেই জাগিয়ে তুলতে চান 'দৃশ্য' কথাটির প্রয়োগ ও তার প্রায়োগিক জোরের মধ্যে দিয়ে।

মন্বন্তর ও সমরকালীন অবক্ষয়কে এক প্রত্যক্ষত বাস্তব সত্যে পরিণত করতে চান পাঠকের চোখে। দ্বিতীয়তঃ নাটকও এক অন্যতম দৃশ্যশ্রাব্য গণমাধ্যম। সেখানেও দেখার ব্যাপারটাই আসে আগে—আর দেখাটাই ক্রমে শোনাটাকে আরো বেশি জীবন্ত করে তোলে। সেদিক থেকে প্রকৃত বাস্তবকে ফিরে দেখার এই বিষয়টিকেও নাটক নামক গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে তুলে ধরতে 'একটা দৃশ্য' নামকরণের যথেষ্ট প্রায়োগিক তাৎপর্য আছে বলেই মনে হয়।

১৯৯২ সালে তাঁর শেষ গ্রন্থ রচনার সময় শম্ভু মিত্র লিখেছিলেনঃ **"...আমাদের চারপাশে যে সমাজব্যবস্থা, যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা, তারা যে প্রক্রিয়ায় চলেছে তাতে আমাদের সেই উন্মুখ দর্শকদের চিত্তবৃত্তিকে নষ্ট করে দিতে চেষ্টা পাচ্ছে। যাতে কারোর মনে কোনো নীতির প্রতি মর্যাদাবোধ না থাকে। যাতে স্বার্থের ওপরে কোনো মহৎ কিছুতে কারো কোনো বিশ্বাস না থাকে। ...আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অশুভচক্র, আমাদের চাকুরীব্যবস্থার মধ্যে অশুভচক্র, আমাদের শাসনব্যবস্থার মধ্যে অশুভচক্র। যাতে প্রতি মুহূর্তে মানুষেরা হীন হয়, নীচ হয়। সেই অশুভ-চক্রদের সংগঠিত শক্তির সামনে ব্যক্তিগত মানুষ বড় তুচ্ছ, বড় অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে। যে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র মানুষের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিয়ে বাঁচবার জন্যেই ডিমোক্রাসির স্থাপনা, সেই ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র মানুষদের আজ—আমাদের দেশের ডিমোক্রাসির মধ্যেই—প্রতি পদে লাঞ্ছনা, অপমান আর নিরাপত্তার অভাব। যতোক্ষণ না সে কোনো দলে ঢুকে পড়তে পারছে, যে দলের হাতে অনেক লাঠি ও পিস্তল ও বোমা ইত্যাদি আছে। এবং এসবই হচ্ছে ডিমোক্রাসির নাম করে, আমাদের দেশের এই আধুনিক 'ডিমোক্রাসি'-রই ফাঁক-ফোঁকরের আওতায়।-তাই ভয় হয়।"** তাঁর একথার সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায় 'একটা দৃশ্য' নাটকের আবহ, ভাবব্যঞ্জনা এমন কি বিষয়বস্তুও। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সমকালে দাঁড়িয়ে যে ভয় নাট্যকার পান, সে ভয় আমরাও পাই—এমনকি অধুনাতন কালেও হয়তো সে ভয়ের হাত থেকে আমরা একেবারে মুক্ত হতে পারি নি।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১। শম্ভু মিত্র: রচনা সমগ্র-১, সম্পাদনা শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারী ২০১৪
২। শম্ভু মিত্র: বিচিত্র জীবন পরিক্রমা, শাঁওলী মিত্র, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ২০১১
৩। শম্ভু মিত্র: নাট্যভাব, আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১৬
৪। শম্ভুদা: পুনশ্চ, দেবতোষ ঘোষ, কারিগর, বইমেলা, ২০১৬